শীতের দিনে ডালের বড়ি

হাসান নীল

একটি কবিতা ও একটি গল্প:

কুমড়ো ফুলে ফুলে
নুয়ে পড়েছে লতাটা,
সজনে ডাঁটায়
ভরে গেছে গাছটা;
আর আমি
ডালের বড়ি শুকিয়ে রেখেছি।
খোকা তুই কবে আসবি?
কবে ছুটি?

খোকার ছুটি হয়নি। বড়ি শুকাতে দেওয়া মায়েরও অপেক্ষার অবসান হয়নি। কিন্তু ডালের বড়ি ঠিকই বয়ে বেড়াচ্ছে ভাষার দাবিতে প্রাণ হারানো খোকার সঙ্গে মায়ের বেদনাবিধুর আখ্যান। ৮০ বা ৯০ দশকে যাদের শৈশব কেটেছে তারা একটু পেছনে তাকালে দেখতে পান, বাড়ির বারান্দায় বা ঘরের চালে নরম কাপড়ে ঢাকা পাত্রে শুকাতে দেওয়া হয়েছে ছোট ছোট বড়ি। গ্রামের প্রায় বাড়িতে চোখে পড়তো এমন দৃশ্য। বিশেষ করে শীতের দিনে। কেননা শীতকাল হচ্ছে কলাই তোলার মৌসুম। এ সময় চাষিদের ঘরে উঠত মুগ, মসুর, মাসকলাই। আর এসব ডাল দিয়ে তৈরি হতো বড়ি। বড়ি তৈরিতে মুগ ও মাসকলাই ডাল ব্যবহার হয়। তবে দেশে মুগ ডালের চাষ বেশি না হওয়ায় মাশকলাই ডাল দিয়ে বড়ি তৈরির চল বেশি।

প্রথমে উল্লিখিত কবি আবু জাফরের কবিতাটির পটভূমি ১৯৫২ সাল। স্মৃতিচারণায় উঠে এসেছে ৮০-৯০ দশক। তবে বড়ির ইতিহাস বেশ পুরোনো। শোনা যায়, ১৬ শতকের কবি চৈতন্য দেব ডালের বড়ি খেতে ভালোবাসতেন। এর প্রশস্তি উঠে এসেছে তার কবিতায়ও। চৈতন্য দেবের চরিত্রামৃত বইয়ে '*ফুল বড়ি'র কথা পাওয়া যায় এভাবে, 'ফুল বড়ি ফলমূলে বিবিধ প্রকার/ বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ির ব্যঞ্জন অপার*'।

এ থেকে বোঝা যায়, ডালের বড়ির প্রচলন শুরু কয়েক শ বছর বছর আগে থেকে। তখন থেকেই ভারতবর্ষে ডালের বড়ি খাওয়া হতো। গল্পটি নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময়ের। আলীবর্দি খাঁ মৃত্যুর সময় সিরাজকে বলে গিয়েছিলেন ইংরেজদের প্রশ্রয় না দিতে। মসনদে বসে মাতামহের পরামর্শনুযায়ী অনুযায়ীই চলছিলেন। ব্রিটিশদের ওজর আবদারগুলো তেমন একটা আশকারা দিতেন না তিনি। এতে করে শেতাঙ্গদের সাথে সম্পর্কটা সাপ নেউলে ছিল সিরাজের। কলকাতা আক্রমণের সময় তার রোষাণলে পড়েছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ওয়ারেন হেস্টিং নামের এক কর্মকর্তা। তিনি তখন অবস্থান করছিলেন কাশিমপুরে। নবাব কাশিমপুর দখল করে নিলে প্রাণভয়ে হেস্টিং আশ্রয় নেন কাশিমপুর বাজারের মুদি দোকানি কান্তবাবুর কাছে। সাদা সাহেব দুয়ারে এসেছেন দেখে আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন কান্তবাবু। কিন্তু দোকানে কিছু না পেয়ে হেস্টিংয়ের সামনে এনে দেন পান্তাভাত, বড়ি আর চিংড়ি মাছ। বিষয়টি জানাজানি হলে হেস্টিংকে কান্তবাবুর সে

আপ্যায়ন নিয়ে একটি ছড়াও বেঁধে ফেলে স্থানীয় কেউ। যা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তখন। ছড়াটি হলো:

হেস্টিংস সিরাজভয়ে হয়ে মহাভীত
কাশিমবাজারে গিয়া হন উপনীত।

কোন স্থানে গিয়া আজ লইব আশ্রয়
হেস্টিংসের মনে এই নিদারুণ ভয়।

কান্তমুদি ছিল তার পূর্ব পরিচিত
তাহারি দোকানে গিয়া হন উপনীত।

মুস্কিলে পড়িয়া কান্ত করে হায় হায়
হেস্টিংসকে কি খেতে দিয়া প্রাণ রাখা যায়?

ঘরে ছিল পান্তাভাত আর চিংড়ি মাছ
কাঁচা লঙ্কা, বড়ি পোড়া, আছে কলাগাছ।

সূর্যোদয় হল আজি পশ্চিম গগনে
হেস্টিংস ডিনার খান কান্তের ভবনে।

ডালের বড়ি তৈরি প্রক্রিয়া

নাম শুনেই বোঝা যায় বড়ি তৈরির মূল উপকরণ ডাল। সেটা মসুর মুগ মাসকলাই বিভিন্ন ডাল হতে পারে। ডাল যেটাই হোক বড়ি তৈরির নিয়ম একই। আগের রাতে ডাল ভিজিয়ে রাখা হয়। পরদিন সকালে ভিজিয়ে রাখা ডালগুলো ফুলে উঠলে কাপড়ে বেঁধে পানি ঝরানো হয়। গ্রামবাংলায় একে ঝরনা দেওয়া বলে। এরপর শুরু হয় বড়ি তৈরির দ্বিতীয় ধাপ। ঝরনা দেওয়া ডাল প্রথমে জাতায় পিষে লেই কিংবা পেস্ট বানানো যথেষ্ট হ্যাপার কাজ। প্রথমে পাটা বা জাতার সাহায্য খুব ভালোভাবে মিহি করে নিতে হয়। এরপরের ধাপটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ডালের এই লেইয়ের ওপর বড়ির স্বাদ নির্ভর করে। লেই ভালোভাবে ফেটিয়ে নিতে হয়। লেইয়ে বাতাস থাকা যাবে না। অন্যথায় বড়ি স্বাদে তিতকুটে হতে পারে। লেই রুটির মতো রাখতে হয়। এরপর কাপড়ের পুটলিতে লেই ভরতে হয়। পুটলিতে একটি ফুটো রাখা আবশ্যক। এরপর পাত্রে পুটলি থেকে লেইয়ের বড়ি ফেলা শুরু হয়। প্রক্রিয়াটি অনেকটা জিলাপি তৈরির মতো। বড়ি বানানো শেষে একটি পাতলা কাপড়ে তেল মেখে তার ওপর বড়িগুলো রেখে রোদে শুকাতে দিতে হয়।

তবে পশ্চিমবঙ্গের গৃহিণীরা বড়ি তৈরির ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ নিয়ম মানতেন। আয়োজন করেই বড়ি বানাতেন তারা। আগের দিন ডাল পানিতে ভিজিয়ে রাখতেন। সেইসঙ্গে ধুয়ে ফেলতেন সকল পোশাকাদি। বাড়িতে একরকমের হইচই পড়ে যেত। পরদিন সকালে উঠে গোসল করে, ঘর দুয়ার লেপে পুছে পুতঃপবিত্র করে নিতেন। এরপর ধোপদুরস্ত কাপড় পরে শুরু করতেন বড়ি বানানো। এখনও এই নিয়ম মানা হয় কি না সে বিষয়ে কোনো তথ্য জানা যায়নি।

বড়ি তৈরির উদ্দেশ্য

সাধারণত দুটি উদ্দেশ্যে বড়ি তৈরি করা হতো। এক হচ্ছে সংরক্ষণ। তখন রেফ্রিজারেটর আসেনি। তাই খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করাটা বলতে গেলে অসম্ভবই ছিল। তবে বাড়ির বউঝিরা খাদ্যদ্রব্য দিনের পর দিন ঘরের তাকে রেখে দিতে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতেন। ডালের বড়ি তারই এক রূপ। আরও একটি কারণ রয়েছে এই বড়ি তৈরির। এটি নিরামিষ তরকারির গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার হতো। বিভিন্ন ধরনের সবজির নিরামিষ ঘন্টতে ডালের বড়ি দিয়ে তরকারি রান্না হতো। আজকাল ঘরে তেমন কিছু না থাকলে তরকারিতে ছেড়ে দেওয়া হয় ছোট মাছের গোটাকতক শুঁটকি। বড়ির ব্যবহার অনেকটা সেরকমই বলা যায়। ডালের বড়ি ভেজেও খাওয়া হয়।

বড়ির প্রচলন আগেই মতো নেই

আজকাল বড়ির প্রচলন আগের তুলনায় অনেকাংশে কমে গেছে। দেশের বেশকিছু অঞ্চলে বড়ি তৈরি করা হয়। এরমধ্যে বিক্রমপুর-মানিকগঞ্জ, যশোর-খুলনা এবং উত্তরবঙ্গের রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চল উল্লেখযোগ্য। তবে অন্যান্য অঞ্চলে যে বড়ি তৈরি হয় না এমন নয়।

বড়ির প্রকারভেদ

বড়ির বেশকিছু প্রকারভেদ আছে। এগুলো হলো ফুলবড়ি, কলাইবড়ি, মসলাবড়ি ও গহনাবড়ি। এরমধ্যে গহনাবড়ি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডালের বড়ি ছোট বড় দুই ধরনের হয়। আকারভেদে এদের ব্যবহারও আলাদা। ছোট বড়ি সাধারণত ভর্তা বা ভাজা খাওয়ার জন্য তৈরি করা হয়। আর বড়গুলো তরকারিতে ব্যবহারের জন্য বানানো হয়। যদিও আকারে ছোট বড়িও তরকারিতে দেওয়ার উপযোগী। তবে তরকারিতে না দিয়ে ভেজে ভর্তা করে খাওয়া হয় বেশি।

বড়ির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় গয়নাবড়ি। তৈরি প্রক্রিয়া ডালের বড়ির মতোই। তবে বানানোর সময় হাতের দক্ষতায় নকশা ফুটিয়ে তোলা হয় বড়িতে। এটিই মূল আকর্ষণ। শুধু তরকারিতে দিয়ে খাওয়া হয় না গয়নাবড়ি। ডুবা তেলে ভেজেও খাওয়া হয়। সকালের নাস্তায় কিংবা চায়ের সাথে বেশি ব্যবহৃত হয় গয়নাবড়ি। এর উৎপত্তি ভারতের মেদিনীপুরে।

বড়ি খেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন রবি ঠাকুর

শোনা যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মুগ্ধ হয়েছিলেন এর স্বাদে। ঘটনাটি ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরের। বিশ্বভারতীতে পড়তো মেদিনীপুরে স্বদেশ নারায়ণ মাইতির ভাইপো আশীষ এবং ভাইঝি সেবা। সেবার ভাইবোনের জন্য বাড়ি থেকে পাঠানো হয়েছিল বেশকিছু খাবার। এরমধ্যে গহনাবড়িও ছিল। এ খবর কানে যায় রবিঠাকুরের। বলাবাহুল্য শান্তিনিকেতনবাসীর কাছে এটি অপরিচিত ছিল। তাই রবি ঠাকুর বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। আর সচক্ষে দেখে তো যারপরনাই মুগ্ধ হন। খাদ্দদ্রব্যও যে এতটাই শৈল্পিক হতে পারে কখনও ভাবেননি তিনি। গহনা বড়িতে মুগ্ধ কবি বড়ি কারিগরের কাছে মনোভাব না প্রকাশ করে থাকতে পারেননি। আশীষ ও সেবার ঠাকুরমা শরৎকুমারী দেবী এবং মাতা হিরন্ময়ী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখেছিলেন,

"তোমাদের হাতের তৈরি বড়িগুলি পাইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। ইহার শিল্পনৈপুণ্য বিস্ময়জনক। আমরা ইহার ছবি কলাভবনে রক্ষা করিতে সংকল্প করিয়াছি। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে।

ইতি শুভাকাঙ্ক্ষী,
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২১ এ মাঘ, ১৩৪১।"

কবিগুরুর পাঠানো পত্রে এমন প্রশস্তি শুনে হিরন্ময়ী দেবী পরের বছর থেকে কলাভবনে গয়নাবড়ি তৈরি শেখানো শুরু করেন।

অনেকের জীবিকা চলে বড়ির ওপর

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও অনেকে ডালের বড়ি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। গাইবান্ধার ফলগাছা গ্রামের সেনপাড়ার কথা বলা যেতে পারে। এ পাড়ায় শীতকালে গেলে দেখা যায়, কেউ উঠানে বড়ি শুকাতে দিয়েছে কেউবা প্রস্তুতি নিচ্ছে বড়ি বানানোর। কেউবা জোগাড় করছে বড়ি তৈরির সরঞ্জামাদি। সেনপাড়ার মানুষজন জীবিকা নির্বাহ করে ডালের বড়ি বানিয়ে। রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, লালমনিরহাটসহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন হাট-বাজারে বড়ি বিক্রি করেন তারা। প্রতি কেজি বড়ি পাওয়া যায় ৩৫০-৪০০ টাকায়। শুধু সেনপাড়া নয় দেশের আরও কিছু অঞ্চলেও হারিয়ে যেতে বসা ডালের বড়ি বেঁচে আছে জীবিকার তাগিদে বড়ি বানানো মানুষের মাধ্যমে।

বড়ি দিয়ে ইলিশের ঝোল

উপকরণ

ইলিশ মাছ ৪ টুকরা, মাষকলাই ডালের বড়ি ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজ বাটা আধা কাপ, আদা বাটা ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ, মরিচ গুঁড়া ২ চা চামচ, কাঁচা মরিচবাটা আধা চা চামচ, তেল আধা কাপ, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি

ইলিশ মাছে হলুদ ও লবণ মেখে ভেজে আলাদা করে রাখুন। এবার ডালের বড়িগুলো তেলে ভেজে নিন। একই তেলে বাটা ও গুঁড়া মসলা দিয়ে কষিয়ে নিন। এরপর ভাজা ডালের বড়ি দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ঢেকে দিন। সিদ্ধ হয়ে এলে ভেজে রাখা ইলিশগুলো দিয়ে ২ মিনিট মাঝারি আঁচে রান্না করে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।